১ম বর্ষ
কার্ত্তিক ১৩৩৫ ৪র্থ সংখ্যা।
"Seek and ye shall find"
আরাধনা
খুলনা বি, কে, ইউনিয়ন স্কুলের মুখপত্র।
President--
Woopendra Nath Chatterjee, B A, B.T.
Headmaster,
Editor-in-chief --
Akshoy Kumar Roy choudhury.
PALLICHITRA
PRESS
BAGERHAT

CONTENTS

লোভের পরিণাম।

শ্রীহরেন্দ্র নাথ ঘোষ—৪র্থ শ্রেণী।

আমরা সতত ভয় করি, কখন কোন শত্রু আমাদের অনিষ্ট করিবে; কিন্তু আমাদের শরীরের ভিতরে যে সব শত্রু নিয়ত অনিষ্ট সাধনের চেষ্টায় নিরত আছে তাহাদিগের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করি না। পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই শত্রুগুলি কাম, ক্রোধ, লোভ ভিন্ন আর কিছুই না। যে মানব এই শত্রুগুলিকে জয় করিতে পারেন তিনিই মনুষ্য-পদবাচ্য। পরমেশ্বর আমাদিগকে সংযম-শক্তি দিয়াছেন, আমাদের সংযমী হওয়া কর্ত্তব্য, এই শত্রুগুলির মধ্যে লোভ একটী প্রধান শত্রু। একজন মানুষ লোভের বশীভূত হইয়া কেমন করিয়া আপনার স্ত্রীপুত্র ও নিজের জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন তাহাই বিবৃত হইতেছে।

—হজরতের শিষ্য মাবিয়ার পুত্র মহারাজ এজিদের চক্রান্তে যখন কুফানগরে মোসলেম নামক জনৈক সেনাপতি সসৈন্যে নিহত হয়েন তখন তাহার পুত্রদ্বয় পলাইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ যখন কুফাধিপতির কর্ণগোচর হইল তখন তিনি ঘোষণা করিলেন, যে এই যুগল শিশুকে ধৃত করিতে পারিবে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে। জগতে বহুবিধ লোক আছে, কেহ এ সংবাদে মর্ম্মাহত হইল কেহ বা লোভের বশীভূত হইয়া তখনই ইহাদের সন্ধানে ছুটিল।

এদিকে মোসলেমের পুত্রদ্বয় অনেকস্থান ঘুরিয়া ও পথ না পাইয়া কুফানগরের এক বৃক্ষকোটরে গলা গলি হইয়া বসিয়া রহিল। সেই উদ্যানের মালিক হারেস নামক জনৈক মুসলমান। এই বাড়ীর পরিচারিকা সন্ধ্যার পরে পুকুর হইতে জল আনিতে গিয়াছিল। সে দেখিল জলে দুইটি মনুষ্যের ছায়া স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সে আস্তে আস্তে বৃক্ষকোটরে যাইয়া দেখিল দুইটী সুকুমার শিশু গলা গলি হইয়া বসিয়া আছে। পরিচারিকা অত্যন্ত কোমল-স্বভাবা ছিল। সে তাহাদিগের পরিচয় ও এরূপভাবে বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা আদ্যোপান্ত

বলিয়া একটু নিরাপদ আশ্রয় ভিক্ষা করিল। পরিচারিকা তাহাদিগকে লইয়া অতি সন্তর্পনে কর্ত্তাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। হারেস সে দিন কোন কার্য্যের জন্য রাজধানীতে গিয়াছিল। কর্ত্তাঠাকুরাণী ও তাহার পুত্র তিনটী এই যুগল শিশুর প্রাণ রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইয়া শয়ন করাইয়া রাখিল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় হারেস আধ-মরা অবস্থায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহিণী বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। হারেস বলিল, সে যখন রাজধানীতে যাইয়া উপরোক্ত ঘোষণার কথা শুনিল তখন হইতেই উভয়ের খোঁজ করিতেছে। কিন্তু কপাল মন্দ বলিয়া এখনও তাহাদের খোঁজ পাইল না। যাহা হউক গৃহিণী স্বামীকে খাওয়াইয়া ঘুম পাড়ানর চেষ্টা করিতে লাগিলেন একবার হারেসকে নিদ্রিত করিতে পারিলে শিশুদ্বয়কে তাহাদের বাসস্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। শিশুদ্বয় তখন স্বপ্ন দেখিতেছিল যে হজরত মহম্মদ তাহাদিগকে বলিতেছেন "আমি তোমাদিগকে লইতে আসিয়াছি"। তাহারা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। দুইটী শিশুর ক্রন্দনে হারেসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে পত্নীকে বলিল কাহারা কাদিতেছে উহাদিগকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস। হারেস-পত্নী দেখিলেন এখনই তাহার সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইয়া যায় তাই সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত ভাবে স্বামীকে বলিয়া তাহাদিগের জীবন ভিক্ষা করিলেন। হারেস বলিল, "হাঃ! আমি কি পাগল! লক্ষ টাকা আমার ঘরে অথচ আমি ইহার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছি। উহাদিগকে এখনই বন্ধন করিয়া লইয়া আইস।" গৃহিণী তখন তাহার তিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন আমরা যেরূপে পারি উহাদিগকে রক্ষা করিব। তাহারাও একবাক্যে স্বীকার করিল আমাদের জীবন দিয়া রক্ষা করিতে হইলেও রক্ষা করিব। হারেস অগত্যা নিজেই তাহাদিগকে আনিতে চলিল। প্রথমতঃ তাহার এক পুত্র বলিল আপনি ইহাদিগকে লইতে পারিবেন না। হারেস লোভের বশীভূত। বাধা পাইয়া পুত্রের স্কন্ধে তরবারির আঘাত করিল। এইরূপে তাহার ৩ পুত্র ও পত্নী হত হইল। পরদিন প্রভাতে হারেস শিশুদ্বয়ের ছিন্ন মস্তক লইয়া রাজধানী

অভিমুখে যাত্রা করিল। কুফাধিপতি এই ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "তুমি স্ত্রী পুত্র হন্তা, তাহাতে আবার আমার দুই শিশুর প্রাণনাশ করিয়াছ তুমি লোভী, নরহন্তা, কুক্কুর। আমি তোমাকে প্রাণদণ্ড দিতেছি। ইহাই তোমার পাপের শাস্তি, তোমার ন্যায় লোভীর পাপের পরিণাম ইহাই হওয়া উচিত।" ঘাতক হারেসকে লইয়া তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিল, হারেস লোভের বশীভূত হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব ও নিজ জীবন লোভানলে বিসর্জ্জন দিল।

মোছাফিরের ডাইরী।

(শ্রীবিজয়চন্দ্র ঘোষ—শিক্ষক।)

সূচনা :— বিদেশ ভ্রমণের একটা প্রবল ইচ্ছা বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি। এর মাঝে কত আকাঙ্খা বুদ্বুদের ন্যায় হৃদয়ে উঠ্‌ল এবং বিলীন হ'ল তার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু ঐ একটী আকাঙ্খা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজ্জাগত হ'য়ে প'ড়েছে। স্কুল এবং কলেজে পাঠ্যাবস্থায় যখনই সুযোগ পেয়েছি সাধ্য মত বিদেশে ঘুরে এসেছি; কিন্তু সে ঘোরায় ততটা সুখ পাই নি কারণ প্রায়ই বাড়ীতে না ব'লে চ'লে যেতাম; ফিরে এলে বকুনি খাবার ভয়টা সর্ব্বদাই মনের কোণে উঁকি দিত। কাজেই সে বেড়ানটা তত আনন্দের হয় নি। তারপর চাকুরী জীবনে প্রবেশ করে অনেকটা স্বাধীনভাবে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি এবং পূজা ও গ্রীষ্মের ছুটীতে বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাটী যথাসাধ্য চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেছি। তবে এটাও যে একেবারে নিরুদ্বেগে হয়েছে তা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হবে; কারণ স্কুল মাষ্টারী চাকুরীটা বিশেষতঃ private school এ খুব মোটা বেতনের কিনা এ হেন স্কুল মাষ্টারের পক্ষে পয়সা খরচ করে বিদেশ ভ্রমণটা কতদূর আরামের তা আমার দলের মাষ্টার মহাশয়রা বেশ ভাল রকমই বুঝেন, যা হোক এরূপ অপব্যয়

জীবনে কিছু কিছু ক'রে এসেছি এবং ভবিষ্যতে করবার প্রবল ইচ্ছাও আছে। তবে কতদূর কি হবে তা শ্রীভগবানই জানেন। এইরূপ কোন কাগজে যে আমাদের বেড়াবার কথা কোন দিন লিখ্‌ব এমন একটা ভাব কখনওই মনে জাগে নি। ২।১ জন বন্ধুর অনুরোধে, বিশেষতঃ আমার সহৃদয় সাহিত্যিক বন্ধু আলি সাহেবের অনুরোধে গত শারদীয়া পূজার অবকাশে যে যে স্থানে গিয়াছিলাম তার সম্বন্ধে কিছু লিখিব। হয়ত এটা পড়ে ছাত্রগণ কতকটা আনন্দ লাভ করতে পারে, এবং তাদের মনে বিদেশ ভ্রমণের একটা প্রবৃত্তি জাগতে পারে। গত পূজার ছুটীর কিছু পূর্ব্বে কয়েকটা দেশ দেখার ইচ্ছা আমাদের তিন বন্ধুর মনে জাগে, আমাদের route mention করে The chief commercial Manager of Rates and Development E. I.R. এর কাছে গত ৯ই অক্টোবর তারিখে একটা দরখাস্ত করিলাম। যথা সময়ে জবাব পেয়ে আমাদের জন্য তিন খানা টিকেট issue করার নিমিত্ত হাওড়ার Station Superintendent কে instruct করিতে ১৮ই অক্টোবর তারিখে একটা তার করিলাম। ১৯ শে অক্টোবর ২রা কার্ত্তিক শুক্রবার আমরা খুলনা হইতে রাত্রে ডাক-গাড়ীতে রওনা হইয়া ২০শে অক্টোবর প্রাতে Dum Dum cantonment এ নামলাম এখান থেকেই আমাদের ভ্রমণ সুরু হল বলা যেতে পারে। ওখানে একটী আত্মীয়ের বাসায় লোটা কম্বল রেখে হাত মুখ ধুয়ে স্থানটা দেখতে গেলাম। টাউনটী ছোট নহে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড barrack গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ব্বে যে স্থানে অসংখ্য গোরা সৈন্য থেকে দেশের "Discipline and order' রক্ষা করত আজ সেখানে অসংখ্য বাদুর আর চাম্‌চিকা British শাসন-ভয় উপেক্ষা ক'রে সদর্পে রাজত্ব করছে "কালস্য কুটীলা গতি"। কয়েকটী বড় বড় কল্‌কারখানা দেখে এরোপ্লেন ষ্টেসন্ দেখতে যাচ্ছিলাম কিন্তু একটু দূর বলে আর যাওয়া হল না। বাসায় ফিরে স্নান-আহার সেরে টিকেট করিতে হাওড়ায় গেলাম। সে ভারটা আমার উপরই পড়ল। টিকেট করারও একটী বিরাট কাহিনী আছে। তা লিখে পাঠকের অধৈর্য্য আর বাড়াতে চাহি না। টিকেট নিয়ে সন্ধ্যার সময় দমদম ফিরে এসে তিন বন্ধুতে মিলে Deradun express ধরবার জন্য তখনই হাওড়ায় রওনা হলাম।

সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় ঐ গাড়ী ছাড়ে; কাজে কাজেই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে আমরা হাওড়া ষ্টেসনে পৌছিলাম। বলাবাহুল্য আমরা একশত এগারর (৩য় শ্রেণীর) যাত্রী কাজেই আমাদের জন্য সহৃদয় রেল কোম্পানীর কত দরদ (?) এবং কি সুন্দর ব্যবস্থা তারা করে রেখেছে তা পাঠকবর্গ প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর প্রত্যক্ষ করেছেন। যদিও ট্রেন ছাড়ার বেশ কিছু পূর্ব্বে ষ্টেসনে পৌছিলাম তা হলেও কোন প্রকারে gate pass করিতে পারি না, অপরাধ আমরা ৩য় শ্রেণীর যাত্রী। রেলওয়ে কোম্পানির আদর শেষটায় বদ হজম হ'য়ে উঠল কাজে কাজেই অগতির গতি কুলির শরণাপন্ন হলাম। দুটী কুলিকে বার আনা বক্সিস দিয়ে চারি আনা জীবনীশক্তির বিনিময়ে অতি কষ্টে একটা carrigeএ চাপলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একখানি গাড়ীর ধার দিয়ে যখন আমরা যাই তখন খুলনার জনৈক কোট প্যাণ্টধারী নব্য উকিল জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেন তিনি বললেন "আপনারা ডেরাডুন একস্প্রেসে যাওয়ার দুরাশা ত্যাগ করুন, কোথাও জায়গা পাবেন না, বৃথা চেষ্টা" মনে করলাম তাত বটেই! কারণ আমাদের হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট, এর কোন টাই নাই, আছে মাত্র লোটা আর কম্বল, যা হোক তার অযাচিত সদুপদেশ একেবারে হাল্ ছাড়লাম না। অনেক জায়গায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে অবশেষে একটী হিন্দুস্থানী যুবকের (বাঙ্গালীর নয়) self sacrificeএ একখানা carriage এ ঢুকে পড়লাম। ৩।৪ জন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক সেই গাড়ীতে ছিলেন। বলা বাহুল্য তারা সাধ্যমত বাধা প্রদান করতে ক্রুটী করেন নাই। দয়ালু রেল কোম্পানীর কথা মনে হ'তে লাগ্ল "যার জন্যে তুমি রামের মা তারে তুমি চিন্‌লে না" যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তোমরা পেটটী মোটা করে বসে আছ তাদের সুবিধার জন্য কি চমৎকার ব্যবস্থাই করে রেখে দিয়েছ। ধন্য তোমাদের ন্যায়পরায়ণতা। আমাদের সুবিধা অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া ৮টার সময় দেরাদুন এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল। বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, সীতারামপুর ইত্যাদি কয়েকটী বড় বড় ষ্টেসনে touch করে ২১শে অক্টোবর প্রাতে গাড়ী গয়াধামে পৌছিল। (ক্রমশঃ)

নদী।

(শ্রীহরেন্দ্র নাথ বসু,—১ম শ্রেণী।)

কোথায় থাকি, কোথায় যাই, কেউ তা জানে না।
দেশ ছেড়ে দেশ পার হ'য়ে যাই নাইকো ঠিকানা॥
বাঁধন ভাঙ্গার সাধন আমার পূর্ণ সদা প্রাণ।
দিবানিশি কুলু কুলু গেয়েই যাচ্ছি গান॥

পাপীর শাস্তি।

[শ্রীঅনিলকুমার রাহা—৫ম শ্রেণী]

ভৈরব নদের তীরে মসিদপুর গ্রামে এক ঘর নমঃশূদ্র বাস করিত। সেই পরিবারের কর্ত্তা নবীন মণ্ডলের দুই পুত্র এবং এক কন্যা। নবীন মণ্ডলের স্ত্রী পূর্ব্বে মারা গিয়াছিল। সে বৎসর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, কারণ অতি-বৃষ্টিতে দেশে অজন্মা হইয়াছিল। নবীনের ঘরে সামান্য কিছু বীজ ধান্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এদিকে জমিদারের দুই বৎসরের খাজানা বাকী পড়ায়, পেয়াদা আসিয়া প্রত্যহ তাগাদা দিয়া যায়। নবীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঠশালায় পড়িত। সে পাঠশালা হইতে আসিয়া পিতাকে বলিল,—"বাবা, আমার তিন মাসের মাহিনা বাকী পড়িয়াছে, মাহিনা না দিলে পাঠশালায় গুরু মহাশয় পড়িতে দিবেন না।" এই সব দেখিয়া শুনিয়া নবীন মহা ভাবনায় পড়িল। নবীনের বীজ ধান্য যখন ফুরাইল তখন নবীনকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল, কিন্তু ভিক্ষা দিবে কে? সমস্ত দেশময় দুর্ভিক্ষ। নবীন অতি কষ্টে কয়েকজন ধনী লোকের বাড়ী হইতে কিছু চাউল সংগ্রহ করিল এবং পুত্রদ্বয়কে ও কন্যাকে খাওয়াইল, কিন্তু নিজে

অনাহারে থাকিল। এদিকে রামসিং পেয়াদা আসিয়া জানাইল যে তাহাকে জমিদার হরিনাথ বাবু ডাকিতেছেন। নবীন সেই কথা শুনিয়া জমিদার বাটী অভিমুখে দ্রুতপদে যাইতে লাগিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল জমিদার বাবু, নায়েব ও কয়েকজন পারিষদ সহ তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। নবীন জমিদার বাবুকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবু আমাকে ডেকেছেন কেন?" জমীদার বাবু সক্রোধে বলিলেন, "তোকে কি তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি? বেটা পাজী চাষা, তুই খাজনা দিস্‌নে কেন?" নবীন উত্তর করিল, "বাবু আমার ঘরে এক মুষ্টি চাউল নাই যে আমার পুত্র কন্যাকে খাওয়াই, কি করিয়া খাজনা দিব?" তখন জমিদার বাবু বলিলেন, "তুই খাজনা দিবি কিনা বল, আমি ওসব কথা শুনতে চাইনে।" নবীন হাত যোড় করিয়া বলিল "বাবু আপনার খাজনা কিছুদিন পরে দিব।" পারিষদ শ্রীনাথ বাবু বলিলেন "বেটা ভারী পাজী তোকে এখনি খাজনা দিতে হবে।" তখন জমিদার বাবু সক্রোধে বলিলেন, "রামসিং এই বেটাকে পঁচিশ ঘা বেত লাগাও।" এই শুনিয়া রামসিং বেত মারিতে লাগিল এবং নবীনের মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল এবং ভীষণ চীৎকার করিয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। নবীন কিছুক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিল। নবীনের জনৈক প্রতিবেশী এই সংবাদ থানায় দিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জমিদার বাবু বলিলেন যে নবীনের পূর্ব্বে মৃগী রোগ ছিল। সে মৃগী রোগে মারা গিয়াছে। কিন্তু দারোগা সে সব কথা না শুনিয়া জমিদার ও রামসিংকে হাতকড়ি দিয়া থানায় লইয়া গেল। এদিকে নবীনের সৎকার হইল এবং তাহার পুত্র কন্যারা জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে স্থান পাইল।

* * * * *

যথাসময়ে সেসন কোর্টে বিচার আরম্ভ হইল। জজ্ জুরিগণের সহিত একমত হইয়া রায় দিলেন। জমিদারের ৫ বৎসর কারাদণ্ড ও রামসিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সদাশয় জজ্ নবীনের পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে কিছু বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন।

———

বিদায়।

শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়—দ্বিতীয় শ্রেণী।

আজি মধুপুরে, জমিদার গেহে, উঠিছে বাজনা-ধ্বনি
বৃদ্ধ, যুবক, প্রৌঢ়, বালক ছুটিছে বাজনা শুনি;
জমিদার সুত নন্দদুলালের, অন্নপ্রাশন তরে
আনিছে বহিয়া পল্লীবাসীরা সুখাদ্য ভারে ভারে।
কেহ বা গাহিছে, কেহ বা নাচিছে, মনের উল্লাসে মাতি,
যথা রজনীতে, নাচিয়া বেড়ায়, যত জোনাকির পাঁতি।
বড় ধুমধামে, বড় আয়োজনে প্রমত্ত পল্লীবাসী;
যাত্রা কথকথা নৃত্য গীত আদি হইতেছে দিবানিশি।
এ হেন সময়ে, শ্রীধর জোলা, রাজার সম্মুখে আসি,
প্রণমি কহিল বিনয় বচনে দুঃখের নীরে ভাসি;—
"শুন মহারাজ নালিশ আমার করি গো তোমার পায়
বড়ই সাধের ছাগটীকে আমি হারাইনু আজি হায়।"
শুনি রাজা কহে "আমারই তরে আনিয়াছি উহা ধরি,
আমি তোর রাজা, তুই মোর প্রজা, তাতে এত বাড়াবাড়ি?
কে আছে হেথায়?" হাকিলেন রাজা গুরু গম্ভীর স্বরে;
"আজ্ঞে হুজুর, আমি রামসিংহ, রহিয়াছি এই দ্বারে।"
বলিলেন রাজা "লাগাও ইহারে একশত বেত্রাঘাত"
সপাসপ তার, গাত্রে পড়িল, সেই মত কশাঘাত।
কাঁদিতে কাঁদিতে মনের দুঃখে চলিল শ্রীধর ফিরি
সেইদিন হইতে ভুগিল শ্রীধর, পাঁচেক কাল ধরি।

হেথায় একদা জমিদার গেহে, উঠিছে ক্রন্দন রোল,
শ্মশানে লইয়া যেতেছে দুলালে, উচ্চারিয়া "হরি বোল।"
শ্রীধর যখন শুনিল এ কথা, অনেক প্রজার মুখে,
ছুটিয়া চলিল অতি দ্রুত বেগে, শ্মশানের অভিমুখে।
সর্প আঘাতে মরিয়াছে শুনি কহিল শ্রীধর ধীরে
"বাঁচাইব আমি" এতেক বলিয়া বসিল তাহার ধারে।
কিছুক্ষণ পরে নড়িয়া উঠিল নন্দদুলাল রায়;
আনন্দে তাহারে সকলে লইয়া চলিল তাদের গাঁয়।
আজি শ্রীধরের স্নেহময়ী মাতা শমনের ডাক শুনি
রহিল না আর ত্যজিলেক ধরা রাখিয়া নয়নমণি।
সৎকার করি শ্রীধর যখন ভাসিতেছে অশ্রুনীরে;—
এমন সময়ে জমিদার বাবু ফিরিছেন মধুপুরে।
বৃন্দাবন হতে নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিবার কালে
কুমার তাঁহার নন্দদুলাল পড়িল নদীর জলে।
গেল গেল বলি সকলে চীৎ-কারি উঠিল মিলিত স্বরে
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া রহিল নীরে।
দূর হ'তে তাহা দেখিবারে পেয়ে শ্রীধর ভাবিল মনে,
"এতদিন পর দয়া করেছেন ভগবান এই দীনে।
বাঁচাইব আমি এতেক বলিয়া লম্ফ প্রদান করি,
ধরিল কুমারে যতনে তাহারে তুলিল নৌকোপরি।
রাখিয়া তাহারে সাঁতারি চলিল, শ্মশানের অভিমুখে
আনন্দে ও ভয়ে নির্ব্বাক সবে কথা নাই কারো মুখে।
রাজা ডাকিলেন, "শ্রীধর! শ্রীধর! আয় মোর বুকে আয়"
শ্রীধর শুধু বলিয়া উঠিল, "আজিকার দিনে নয়।"
পরদিন রাজা অতি ত্বরা করি তাহার আলয়ে আসি

দেখিলেন তিনি শ্রীধরের জ্বর বাড়িয়াছে খুব বেশী।
নিজের বলিতে পৃথিবীতে আর নাইকো তাহার কেহ,
একাকী পড়িয়া র'য়েছে শয্যায় শ্রীধরের ক্ষীণ দেহ।
রাজা ডাকিলেন "শ্রীধর! শ্রীধর! আয় মোর বুকে আয়"।
শ্রীধর যেন গো বলিয়া উঠিল 'আজিকার দিনে নয়'।
কাতর কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন "ক্ষম হে," শ্রীধর মোরে
অতি ক্ষীণ স্বরে কে কহিল তাঁরে, "ক্ষমেছেন প্রভু তোরে।
একাকী রাজা গৃহের মাঝারে কাঁদিতেছিলেন যবে;
শ্রীধর যেনগো বলিয়া উঠিল "আসি মহারাজ তবে।"
নিবিল সে দীপ, চলিল শ্রীধর, মুক্তির পথে সুখে
একাকী রাজন্ পড়িয়া রহিল অতীব মনের দুখে।
রাজা ডাকিলেন "শ্রীধর! শ্রীধর! আয় মোর বুকে আয়।
প্রতিধ্বনি যেন বলিল রাজায়, বিদায়—বিদায়—বিদায়"।

কথা মাহাত্ম্য।

মুজিবর রহমান—৪র্থ শ্রেণী।

কথা দয়াময় স্রষ্টার একটী শ্রেষ্ঠ দান। কথার মাহাত্ম্যে মানুষ হাসে, কথার প্রভাবে মানুষ কাঁদে। কথা আর কিছুই নয়, কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র।

অপ্রীতিকর কথা বলিতে যতটুকু সময় লাগে, প্রীতিকর কথা বলিতেও ঠিক ততটুকু সময় লাগে; একই সময়ের মধ্যে যদি কথার দ্বারা মানুষকে তুষ্ট করা যায় তবে মনুষ্যকে শক্ত কথা বলিয়া অসন্তুষ্ট করা হয় কেন? লোককে খুসী করাই মানুষের ধর্ম্ম, সুতরাং ভাল কথা বলিয়া সকলেরই করুণাময়ের দানের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

বিষম ভুল।

শ্রীপরিতোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-দ্বিতীয় শ্রেণী।

ভুলু বাবু নাম তার বুঝিতেই পার
পদে পদে ভুল তার,—ছয় তিনে বার।
ভুলু বাবুর ভুল আর শেষ নাহি হয়
বলি তার এক ভুল শোন তবে তায়।
প্রতিদিন ভুলু বাবু ভ্রমণেতে যায়।
ছড়িটা সঙ্গেতে লয় ভুল নাহি তায়॥
ভ্রমিয়া ফিরেন বাবু সন্ধ্যার পরে।
আলনায় রেখে ছড়ি বসেন চেয়ারে॥
কাগজ পড়াটা তার নিয়ম বিশেষ
প্রতিদিন এক কাজ ভুলের নাইকো শেষ॥
একদিন ভুলু বাবু সন্ধ্যার পরে
ভ্রমণ করিয়া যবে ফিরিলেন ঘরে॥
হায় হায় আজ তায় পাইল কি ভুলে
ছড়িটা চেয়ারে রাখি নিজে রইল ঝুলে।
প্রতিদিন ভুলু বাবু ফিরে এলে ঘরে।
পিতা তাকে কত কথা বলেন আদরে॥
আজ ভুলু আসে নাই রাতি শেষ হয়।
সারা গ্রাম খুঁজে কেহ ভুলুকে না পায়॥
চারি দিকে হৈ চৈ মহা গণ্ডগোল
চারিদিকে কান্নাকাটী 'ভুলু' 'ভুলু' রোল॥
সকলেই কাঁদে ভুলু কোথা গেল চ'লে।
ভুলু কিন্তু ভুল করে আলনায় ঝুলে॥
পুরাতন ভৃত্য এক মতে' নাম তার।
ঘরে ঢুকে বুঝে নিল প্রকৃত ব্যাপার॥
ডেকে বলে "কর্ত্তা তুমি কেঁদনাকো আর"
বের ক'রে দিচ্ছি আমি ভুলুকে তোমার॥
এত বলি ম'তে গেল আলনার পিছে।
গিয়ে দেখে ভুলু বাবু বেশ ঝুলে আছে।
ব্যাপার দেখিয়া সবে হেসে কুটিপাটী।
সকাল বেলায় ইহা গ্রামে গেল রটি।
ছেলে, বুড়ো সকলেই এই কথা কয়।
ভুলু বাবুর গ্রামে থাকা হয়ে গেল দায়॥
অবশেষে ভুলু বাবু গ্রাম ছেড়ে যায়॥
দিনে রেতে এক কথা কার প্রাণে সয়?

জন্মভূমি।

শ্রীকান্তিশ চন্দ্র বসু—দ্বিতীয় শ্রেণী।

চৈত্র মাস। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের প্রচণ্ড কিরণে সমস্ত জগৎটা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। পক্ষীগণ বৃক্ষে বৃক্ষে আহার সংগ্রহ করিতেছে। গাভী-দল আহার ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। মাঝে মাঝে তৃষিত চাতক অতি করুণ কণ্ঠে "ফটিক জল" "ফটিক জল" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোথায়ও বা রাখাল বালকগণ বৃক্ষতলে তাহাদের গামছা পাতিয়া শুইয়া আড়বাঁশী বাজাইতেছে। কৃষকগণ ক্ষেত্রের কর্ম্ম সারিয়া ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিতেছে। পল্লী-বধূগণ তাহাদের গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া দলে দলে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছে। শুভ্র 'শিবসা' সাগরের উদ্দেশ্যে নিরন্তর নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পিককুল প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার জন্য মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিতেছে।

(২)

দ্বিপ্রহরের ক্ষেত্রের কর্ম্ম সারিয়া 'তাহের সর্দ্দার এই সবে মাত্র বাটী ফিরি-য়াছে। বাটী ফিরিয়া তাহের হুকাটি লইয়া অর্দ্ধনিমিলিত আঁখিতে ধূমপান করিয়া পরিশ্রম দূর করিতেছিল। ধূমপান সমাপ্ত করিয়া মাথায় খানিকটা তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে নদীর দিকে ছুটিল।

(৩)

"শিবসার" উপকূলে তাহেরের জীর্ণ কুটীর অবস্থিত। কুটীরের সম্মুখে শিবসা কল্ কল্ ছল্ ছল শব্দে প্রবাহিত। নদীটি খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে। অন্য দিকে জমিদারের ফলের বাগান। তাহেরের বাটীতে তিনখানি জীর্ণ কুটীর। জীর্ণ কুটীরগুলির প্রতি তাহেরের বড় স্নেহ। এই কুটীরে তাহেরের বাপ ঠাকুরদাদা জন্মগ্রহণ করেছেন আবার এই মৃত্তিকায়ই তাদের কবর দেওয়া হই-য়াছে। এই জায়গাটুকুর জন্য তাহের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না।

(৪)

নদী হইতে ফিরিয়া তাহের আহারে বসিল। আহারান্তে সে হুকাটী লইয়া ধূমপানের ব্যবস্থা করিতেছিল। ধূমপান করিয়া তাহার জীর্ণ মাদুর বিছাইতেছে, এমন সময় শুনিল কে তাহাকে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গামছা কাঁধে করিয়া তাহের বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিতেই জমিদার পাইক "কুলদীপ সিং" তাহাকে বলিল, "তুহারে বাবু ডাক্‌তা হ্যায় জলদি চলো।" তাহের শঙ্কিত চিত্তে বলিল "তুম লোক কুচ জান্‌তা হ্যায়?" পাইক কিছু উগ্রভাবে বলিল, "নেই, নেই।"

(৫)

তাহের পাইকের সঙ্গে চলে গেল। বাটীতে একা তাহেরের পত্নী আমিনা রহিল। এই আমিনাকে তাহের সাত বৎসর বয়সে বিবাহ করে। সে আজ ২০ বছর পূর্ব্বের কথা। আমিনা অশিক্ষিত কৃষক পত্নী হইলেও তার অন্তঃকরণ ছিল খুব কোমল, বিবাহের পর তাহেরের দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। এই কৃষকের একমাত্র আনন্দদায়িনী ছিল, এই আমিনা। কুটীলতার ছায়া মাত্র এই সরলা রমণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

(৬)

জমিদার বাবুর নাম কিরণ বিহারী রায়। অল্প বয়সে জমিদারী পাইলে বাঙ্গালী যুবকদের যেরূপ অবস্থা হয় কিরণ বাবুরও সেইরূপ হইয়াছিল। কুসঙ্গীর অভাব ছিল না। তাহাদের লইয়া আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতেছেন। বাটীতে এইরূপে দিন রাত্র আমোদ প্রমোদ কিরণ বাবুর মাতার ভাল লাগিত না। কিরণ বাবুর পিতা ছিলেন খুব চরিত্রবান আদর্শ জমিদার। কিন্তু তাঁহার পুত্র কিরণ বাবু সম্পূর্ণ পিতার বিপরীত। কিরণ বাবুর পিতা অন্যান্য জমিদারগণের ন্যায় বিলাসপ্রিয় ছিলেন না ও সেইজন্য তাঁহার বাগান বাটীর প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু সংসর্গ গুণে আজ কিরণ বাবুর বাগান বাটীর প্রয়োজন। কিরণ বাবু মোটামুটী মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু সঙ্গ দোষই তাহার পদস্খলনের একমাত্র কারণ। কিন্তু কোন্ প্রজাকে উঠাইয়া দিয়া বাগান বাটী করিবেন? শেষে ঠিক করিলেন তাহের গরীব

তাহাকে হয়ত তাহার জমির দাম দিলেই উঠিয়া যাইবে। ইহা স্থির করিয়া তাহেরকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

তাহেরকে লইয়া কুলদীপ যখন জমিদার বাটী আসিল তখন বেলা দেড়টা। কুলদীপ তাহেরকে প্রথমে বাহির-বাটীর কাছারিতে লইয়া গেল। তাহের সকলকে সেলাম করিয়া দাড়াইল। নায়েব মহাশয় বলিলেন, জমিদার নিজে ডাকিয়াছেন। এখানে তাহাকে ডাকা হয় নাই। "জমিদার বাবু নিজে ডাকিয়াছেন' এই কথা শুনিয়াই তাহেরের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে ভাবিল, না জানি কত গুরুতর অন্যায় সে করিয়াছে, মনে মনে বলিল, যদি ভাল ভাবে জমিদারের নিকট হইতে ফিরিতে পারি, তবে পীরের দরগায় একটি মুরগী দিব। কুলদীপের সঙ্গে সে অতি সশঙ্ক-চিত্তে জমিদারের নিকট চলিল, ভাবিল আজ তার কপালে অনেক কষ্ট আছে এবং সেই কষ্টের জন্য সে বাটি হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

(৮)

জমিদার বাবুর কক্ষে আসিয়া তাহের সেলাম ঠুকিয়া দাড়াইল। জমিদার অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সৌরেন্দ্র ঠাকুরের "মুক্ত পাখী" পড়িতেছিলেন প্রথমে তাঁহার কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অবশেষে কুলদীপ বলিল, "হুজুর, তাহের আয়।" পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া কিরণ বাবু বলিলেন, "তাহের, তোকে তোর ঐ জমিটা ছেড়ে দিতে হবে।" জমিদার বাবুর কথা শুনিয়া তাহেরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। গলায় বস্ত্র দিয়া তাহের বলিল, 'হুজুর মা-বাপ তুমি ও জমিটুকু আমি কিছুতেই ছাড়ব না।"

জমিদার—যা তোর ঠিক দাম তাই পাবি তাতে তোর আপত্তি কি ?

তাহের—হুজুর ও জমিটুকুতে যে আমার কত টান, তা তোমরা বড় লোক, বোঝবা না। আমি ওখান থেকে কিছুতেই উঠব না।

জমিদার—তোর ঐ জমির দাম নিয়ে অন্য যায়গায় বাড়ী তৈরী করে থাকলে আবার সে জায়গায়ও তোর ঐ রকম টান হবে।

তাহের— ঐ জমিতে হুজুর, আমার বাপজান দাদাজী জন্মেছে, আবার ঐখানেই তাদের কবর দিছি। ও জমি আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না।

জমিদার— তোকে ছাড়তেই হবে, পাজি, হারামজাদা, আমার জমি আমার দরকারে আমি পাবো না?

তাহের— তোমার ক্ষমতা থাকে হুজুর নালিশ করে উঠিও। বাপ দাদার বাস্তু ভিটে আমি কিছুতেই ছাড়বো না—কিছুতেই ছাড়বো না।

এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে জমিদার বলিলেন, "কোন হায়" জমিদারের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে রামসিং আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরণ বাবু বলিলেন "এই শুয়ারকে বিশ জুতা মারো।" যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা হারামজাদা। তারপর জমিদার বাবু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "রঙ্গলাল।" দ্রুতপদে একজন যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। কিরণ বাবু বলিলেন "দেখ রঙ্গলাল, যেমন করে পার, দুই দিনের মধ্যে তাহেরের জমি দখল করা চাইই।" রঙ্গলাল বলিল, "আপনার কাজে রঙ্গলাল জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। আজ রাত্রের মধ্যেই আমি এ কাজ হাসিল করব।"

(৯)

জমিদারের হুকুমে তাহাকে বিশ জুতা মারা হইল। তাহের মুসলমানের বাচ্চা, মারের ভয় সে কখনও করে না। মারের সময় একবার বলিল, "আল্লা, খোদা, তুমি এর বিচার করো।" এই কথার বেশী আর তাহাকে কিছু বলিতে দেওয়া হয় নাই।

প্রহারের চোটে দেহের অনেক জায়গায় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। জমিদার বাটি হইতে মাতালের মত টলিতে টলিতে সে বিকালে বাটী ফিরিল। যখন বাটী ফিরিল' তখন আমিনা গৃহের কাজ কর্ম্ম করিতেছে। তাহেরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিল। তাহের আসিয়াই দাওয়ায় শুইয়া পড়িল। আমিনা তাড়াতাড়ি মাদুর পাতিয়া দিল। তাহের তখন অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "আমিনা পা—নি" বলিয়াই চুপ করিল। আমিনা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিল এবং তাহেরের ক্ষত স্থানগুলি ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহের শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। আমিনা শীঘ্র কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া, স্বামীর শুশ্রূষায় রত হইল। তাহেরের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দিবার বিদায় সময়। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন কিরণ বর্ষণের পর পশ্চিমা-

কাশে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পক্ষিগণ নিজ নিজ কুলায়ে বসিয়া, অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় সঙ্গীত গাহিতেছে। গাভীগণ হাম্বা হাম্বা রবে ধূলি উড়াইয়া গৃহমুখে চলিয়াছে। তাহাদের পিছনে রাখাল বালকগণ বাঁশিতে গাহিতে চলিয়াছে। গ্রাম্য রমণীগণ দলে দলে জল আনিতে নদীতে যাইতেছে। সমীরণ পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্যের বিরহে মৃণাল ঢলিয়া পড়িয়াছে বৃক্ষোপরে সূর্য্যদেবের কিরণ ক্রমে বিলীন হইয়া গেল। নিশাদেবী এক একবার উঁকি মারিতেছেন। হংসগণ তখনও মনের আনন্দে সরোবরে কেলী করিতেছে।

ক্রমে দিনের আলো একেবারে নিভিয়া গেল। সকলে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। নিশাচর আহারের সন্ধানে বাহির হইল।

(১০)

স্বামীর নিদ্রা ভাঙ্গিলে আমিনা সব জিজ্ঞাসা করিল। তাহের জমিদার বাটীর সমস্ত ঘটনা তাহাকে শুনাইল। স্বামীর কথা শুনিয়া সরল প্রাণা আমিনা বলিল, "তা জমিদার যখন বলছে, তখন দাও না কেন ছেড়ে।" আমরা দুটী প্রাণী যে কোনও এক জায়গায় একখানা কুঁড়ে বেধে দিনগুলো কাটিয়ে দিলেই হবে।

তাহের— আমিনা তুই কি বলিস্? এখানে আমার বাপ দাদা জন্মেছে আবার এই মাটীতেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছে। এই মাটির প্রত্যেক কণায় তাদের স্মৃতি জড়িত হয়ে রয়েছে। এই জমি তাহের তার দেহের এক ফোটা রক্ত থাকতে ছাড়বে? কখনও না। তুই মেয়ে মানুষ তুই বুঝবি না। এই জমির প্রতি আমার কত টান! এযে আমার "জন্মভূমি"!

আমিনা— জমিদার যদি জোর করে নেয়, তবে তুমি কি করিবে?

তাহের— কি করব! যতক্ষণ দেহে রক্ত থাকে, ততক্ষণ রক্ষা করব। তারপর এই মাটিতেই মরবো তার, পূর্ব্বে নয়।

(১১)

আমিনা তাহেরকে বেশ ভাল ভাবেই চিনিত। সে যাহা বলে, তাহাই করে। সেইজন্য আমিনা চুপ করিল। সেই রাত্রে আমিনার ভাল নিদ্রা হইল

না। কি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, আর ঘুম হইল না। দ্বিপ্রহর রজনী, চারিদিকে নিস্তব্ধ, বাহিরে ঘোর অন্ধকার। এক হাত দূরের লোক চিনিতে পারা যায় না। নিশাচর পক্ষিগণ একবার বিকট চিৎকার করিতেছে। বিটপি সকল নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। সমস্ত জগতটা যেন কি একটা ভয়ে নিস্তব্ধ। আমিনা শুনিল কাহারা যেন তাহাদের ঘরের পিছনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি তাহেরকে ডাকিল। তাহের তাড়াতাড়ি উঠিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল আমার গাছকাটা দা? আমিনা তাহার গাছকাটা দাখানি আনিয়া দিল। দা লইয়া তাহের বাহির হইয়া পড়িল। ঘরের পাশে চুপ করিয়া দাড়াইয়া সেই লোক-দের কথা শুনিতে লাগিল। শেষে বুঝিল যে জমিদারের লোক তাহার ঘর পোড়াইয়া দিতে আসিয়াছে, সে চুপ করিয়া তাহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিল। তারপর যখন দেখিল তাহারা দেশালাই ধরাইয়া তাহার ঘরে আগুন দিতে আরম্ভ করিল তখন সে আর চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দৌড়াইয়া গিয়া একজনকে দায়ের কোপ বসাইলা দিল। "বাপরে" বলেই লোকটা পড়ে গেল। চারিদিক হইতে শত্রু তাহেরকে ঘিরিয়া দাড়াইল।

তাহের একা, আর যাহারা তাহেরের ঘরে আগুন দিতে আসিয়াছিল তাহারা দলে বেশী। তাহের বেশীক্ষণ তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না, অবশেষে তাহের পড়িয়া গেল, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহের বলিল, "হা খোদা, যেন এই মাটিতেই আমার মৃত্যু হয়। বাপজান, তোমাদের এই জমিটুকু তাহের রক্ষা করতে পারলো না। তার জন্য তাহের দায়িক নহে। দায়িক তাহার অক্ষমতা।"

(১২)

তাহেরকে মারিয়া জমিদারের লোক সরিয়া পড়িল। আমিনা এই ব্যাপার দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার এক ভাইয়ের বাড়ী ছুটিয়া গেল ও ভাইয়ের পদ-তলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভাইজান সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সে আর নাই। শিগ্গির চল ভাইজান, আমার সব গেছে।"

(১৩)

তাহেরের বাটীর অদূরেই তাহার শালা কেরামত আলির বাটী। আমিনার কথা কেরামত কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে দৌড়াইয়া আমিনার সঙ্গে তাহেরের বাটী আসিয়া দেখিল তাহার ঘরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার একটু দূরেই মাঠে তাহের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে ও আমিনাকে ডাকিতেছে। তাহেরকে তাহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া কেরামত তাহার বাটীতে লইয়া গেল।

(১৪)

রঙ্গলাল তাহেরের বাটীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া আহত লোকটাকে কাঁধে করিয়া যখন ফিরিলেন, তখন জমিদার বাবু তাহাদের জন্য বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদের নিকট সব শুনিয়া কি একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ধীর পদবিক্ষেপে শয়নকক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া নানারূপ চিন্তায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তর হইতে বলিল, "আজ তুমি নিজের স্ফূর্ত্তির জন্য একজন আদর্শ কৃষকের সর্ব্বনাশ করিলে, এমন কি তার জীবন পর্য্যন্ত তোমার লোকে নিল। তাহের যদি আজ গরীব না হত তবে তুমি তাকে কি করে তার জমিটুকু থেকে বঞ্চিত করতে। ভেবে দেখ আজ যদি তোমার কেউ তোমার বাড়ী হতে উঠে যেতে বলে, তবে তোমার কেমন হয়! গরীবের প্রতি কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নাই। শুধু পীড়ন, গরীব কি শুধু এই ধরাধামের ভীষণ দারিদ্র্য যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য জন্মগ্রহণ করে? তোমার এই অত্যাচারের কি পরিণাম নাই? নিজের সুখের জন্য অন্য প্রাণ নিলে তাতে সুখ হয় না।" এইরূপ ভাবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া ঠিক করিলেন "যদি তাহের বাঁচে তবে তাহার জমিটুকু তাকে ফিরাইয়া দিব ও তাহার এই অপূর্ব্ব প্রাণ ত্যাগের জন্য আরও জমি দান করিব। শেষে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের কাছে তাহেরের প্রাণ ভিক্ষা করিলেন।

(১৫)

মানব যাহা ভাবে, ঈশ্বর ঠিক তাহার উল্টা করেন। পর দিবস যখন তাহেরের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন নিশার বিদায় সময়। নিশাদেবী পৃথিবীর বুক

হইতে অতি সন্তর্পণে তাঁহার আচলখানি টানিয়া লইতেছেন। পক্ষিগণ আনন্দে প্রভাত সঙ্গীতে ব্যস্ত। তটিনী কুল্ কুল্ শব্দে নাচিয়া নাচিয়া সাগরের উদ্দেশ্যে বহিয়া যাইতেছে। তরীগুলি বাণিজ্যের তরে তর্ তর্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কর্ণধার তরীর পিছনে হা'ল ধরিয়া গান করিতেছে (সঙ্গীত বিদ্যার আলাপ করিতেছে)। দূরের গ্রামগুলি অস্পষ্ট আলোকে ছবির মত দেখাইতেছে। কেহ কেহ প্রভাত সমীরণ সেবনের জন্য বাহির হইয়াছেন। পুষ্পের গন্ধ বহন করিয়া বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

(১৬)

তাহের নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমিনার নিকট জিজ্ঞাসা করিল আমি কোথায়? আমিনা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কেরামত বলিল তুমি আমার বাড়ী, ভাই।

তাহের— আমি এখানে কেন?

আমিনা— কাল জমিদারের লোক যে আমাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।

তাহের— আমি তখন কোথায় ছিলাম? আমাকে ঘুম থেকে জাগালি না কেন?

আমিনা— তুমিত কাল রাত্রে তাদের বাধা দিতে গেলে আর তারা তোমায় জখম করে ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল, তখন আমি দৌড়ে ভাইজীকে ডেকে নিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।

তাহের— হয়েছে এবার আমার মনে পড়েছে। আমিনা তুই আমাকে সেই মাটীতে মরিতে দিলি না কেন। সেই মাটিতে আমায় কবর দিলি না কেন? কে তোকে আমায় এখানে আনতে বল্লে? হা খোদা, সেখানেও আমায় মরতে দিলে না। "জন্মভূমিতে" মরতে দিলে না। আমি গরীব আমার দিকে চাইলে না। জমিদারের এত অত্যাচার, তাও তুমি দেখলে না, তবে কেন গরীব করে লোককে রাখ। তোমার দয়া না পেলে গরীব কি করে বাঁচবে, খোদা!

(১৭)

একে দুর্ব্বল শরীর, তারপর এইরূপ উত্তেজনায় সহসা তাহের এক ঝলক রক্ত বমি করিল। মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে "তাহেরের আত্মা সেই

রাজ্যে, যেখানে হিংসা নাই, রাগ নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, দিবা রাত্রে প্রভেদ নাই, জমিদারের পীড়নের ভয় নাই, রোগ নাই, বার্দ্ধক্য নাই, জরা নাই, ধনী ও গরীবে পার্থক্য নাই, সবই এক, সেখানে তাহেরের আত্মা শান্তির জন্য চির শান্তির জ্যোতির তলে বিশ্রাম লাভ করিল। (১৮)

তাহেরের মৃত্যু সংবাদ জমিদার বাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে জোড় হাতে ঈশ্বরকে বলিলেন, "হে বিধাতঃ মানবের একটা দোষ একবারও মার্জ্জনা কর্ত্তে পারো না। আমার এই প্রার্থনাটুকু শুনিলে না। তাহেরের প্রাণটি ভিক্ষা দিলে কি তোমার সৃষ্টি লয় হয়ে যেত? আমার আশা পূরণ করলে না! জমিদার বাবু ঠিক করিলেন যে যাহাতে "তাহেরের" স্মৃতি সহজে জগৎ হইতে মুছিয়া না যায় তাহার জন্য কি করা যায়। শেষে তাহার স্মৃতি রক্ষার জন্য "তাহেরের" সেই জমিতে একটা প্রকাণ্ড মস্জিদ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, এবং একটি "তাহেরের" নামে মুসলমান ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাহা ছাড়া মুসলমান "পরবের" দিন কেহ "তাহেরের" নাম করিয়া তাঁহার নিকট কিছু চাহিলেই প্রাপ্ত হইত। (১৯)

তাহেরের মৃত্যুর পর আমিনা তাহার ভাইয়ের বাটীতেই রহিল, আমিনা তাহেরের স্মৃতি বুকে আঁকড়াইয়া দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। সে আজ একা, কি করিয়া সংসারে সে থাকিবে? জগৎটা যেন এক জনের জন্য ফাঁকা হইয়া গিয়াছে এইরূপ তাহার বোধ হইতে লাগিল। হাপুস নয়নে কাঁদিয়াই সে দিন রাত কাটাইত।

একদিন রাত্রে "আমিনা" তাহেরের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিল তাহাকে তাহের ডাকিতেছে, "আমিনা তুই এখানে আয় এ স্থান বড় সুন্দর, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, জমিদারের উৎপীড়ন নাই তুই আমার কাছে আয়।"

(২০)

স্বপ্ন দেখিয়া আমিনার ভয় ভয় করিতে লাগিল, রাত্রে ঘুম হইল না। ভোরের বেলায় "আমিনা" কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে ঠিক পায় নাই।

কেরামত আমিনার উঠিতে দেরি দেখিয়া তাহার ঘরের দিকে গিয়া দেখিল

আমিনা তখনও ঘুমাইতেছে। সে দুয়ারের ফাঁকের মধ্যে হাত দিয়া দুয়ারের খিল খুলিল এবং আমিনার কপালে হাত দিয়া দেখিল আমিনার জ্বর, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, ধীরে ডাকিল "আমিনা।"

ভাইয়ের ডাকে আমিনা তাড়াতাড়ি উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কেরামত জ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমিনা বলিল কখন জ্বর হইয়াছে তাহা সে জানে না। কেরামত বলিল "শুয়ে থাক্ তুই উঠিস না।" কেরামত গরীব ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার শক্তি তাহার নাই, "টোটকা" ঔষধ দিতে লাগিল।

(২১)

আমিনার জ্বর হইয়াছে তাহা ক্রমে জমিদার বাবুর কানে গেল তিনি তাড়াতাড়ি ডাক্তার পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার আসিল, আমিনা যখন শুনিল জমিদার ডাক্তার পাঠাইয়াছেন তখন সে বলিল প্রাণ থাকিতে সে ডাক্তার দেখাইবে না, কেরামত আসিয়া বলিল, রোগী ডাক্তার দেখাইবে না, ডাক্তার বাবু চলে গেলেন, আমিনা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল, নিষ্ঠুর জমিদার, তুমিই আমার স্বামীর জমিটুকু কেড়ে নিয়েছ, তোমার লোকেই আমার প্রাণের দেবতাকে খুন করেছে; তোমার সাহায্য গ্রহণ করবে আমিনা? কখনও নয়, হে জমিদার, ঠিক জেনো আমিনা মরবে সেও ভাল তার পক্ষে, তবুও তোমার সাহায্য গ্রহণ করবে না। কেরামত আসিয়া মাথায় জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল ক্রমে "আমিনা" নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জ্বরের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছিল। অবশেষে সংসারের সমস্ত যন্ত্রণার হাত হইতে এড়াইয়া তাহার স্বামীর অনুগমন করিল। কেরামত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

(২২)

এই কৃষক দম্পতীর মৃত্যুর পর কিরণ বাবুর অন্তঃকরণ যেন একটা ঝড় বৃষ্টিতে পরিধৌত করিয়া দিয়া গেল। শুভ্র চন্দ্রকিরণ যেমন জগৎটাকে পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়, কিরণ বাবুর মনও সেইরূপ সাধুতায় পরিপ্লাবিত হইয়া গেল। শেষে তিনিও পিতার ন্যায় আদর্শ জমিদার বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন।

খাব খাব।

(শ্রীলবচন্দ্র পাল—শিক্ষক।)

খাব খাব কেন কর এসে বসে খাওনা।
খাওয়ার চূড়ান্ত খাওয়া যাতে তুষ্ট রসনা॥
যত সব খাবার আছে বাংলার ভাষায়।
যোগাড় করিয়ে আনি, থাক সেই আশায়॥
আমিষ ও নিরামিষ তরকারি ভাত ডাল।
চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় মিষ্টান্ন টক ঝাল॥
রসগোল্লা পান্তোয়া ময়রার কারীকরী।
পোলাও চড়্‌চড়ি আদি পাচকের বাহাদুরী॥
চা, জল, দুধ খায় আরো যত পানীয়।
দুষ্ট ছেলে বিড়ি খায় কান ধরে টানিও॥
নানা দেশে লোক আরো কত খায় খাদ্য।
মোদের দেশের লোকের সে সব অখাদ্য॥
ফল বিনা দৈ চিড়া তাহাও ত ফলাহার।
দেখে শুনে খাও যাহা মনে হয় রুচিকর॥
তা না হলে কলা খাও ওকি! তুমি চটো না।
সবে হল খাওয়া সুরু, ধৈর্য্য ধরে রসনা॥
কত কিছু খাবার খায় যত সব দুষ্য।
সিগারেট বিড়ি মুখে, নাক দিয়ে নস্য॥
কেউ কান্দে বেত খেয়ে কেউ বা গালি খায়।
মহাজনে সুদ খায়, ঘুষ খায় দারোগায়॥
ছেলে জলে মিশ খায় কেউ কভু শুনেছ কি?
যুদ্ধে গিয়ে গুলি খায় গুলি খোর সেও কি?
ভিখারীরা তাড়া খায় ভিক্ষাও নাহি পায়।
দিন আনে দিন খায় কত লোকে হায় হায়॥
হুচোটের চোট খেয়ে খোকা ধরে কান্না।
মা বলেন চুমো খেয়ে সেরে গেছে; আর না॥
শিষ্য খায় যতমত কড়া গুরুর তাড়নায়,
খরস্রোতে ডিঙ্গি নিয়ে জেলেরাও পাক খায়॥
ধমক বকুনি খেয়ে না হয় যারা বাধ্য।
কিল চড় লাথি ঘুষি তাহাদের খাদ্য॥
গরমে বাতাস খায় শীতে খায় কম্প।
বৃশ্চিক দংশনে লোক খায় কত লম্ফ॥
পিছলে আছাড় খেয়ে কে লুকায় মুখ।
বৃদ্ধের হাড় ব্যথা মর্ম্মে পায় দুখ॥
ফুট ব'লে ঠেলা খায় ভিড়ে খায় ধাক্কা॥
জেল খানার খানা খেয়ে চোর হয় পাকা।
কাশীতে প্রসাদ খেয়ে পাকা হয় সাধু।
বাপ মার আদর খেয়ে দুলাল হয় যাদু॥
দোলনাতে দোল খায় যত সব খোকারা।
খাবড়িয়ে খোল খায় যত সব বোকারা॥
কত যে মোচড় খায় বেহালার কান॥
কান মলা খেয়ে শেষে খোলে তার গান॥

কথা শুন ভাল হও মাথা খাও যদি।
যাহা তাহা খেয়ে ভোগ রোগে নিরবধি॥
কেন করে গালি খাও, কেঁদেছ সেবারে॥
আনা নুন খেয়ে লাগো পাশ করো এবারে॥
ভেবা চেকা খেয়ো নাকো যেও নাকো ভড়কে
খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বসে খাও খড়কে॥
এত খেয়ে তবু যদি নাহি উঠে মনটা।
খাও তবে কচু পোড়া খাও তবে ঘণ্টা॥

জাপান দেশ।

(শ্রীকামাখ্যা কুমার বসু—চতুর্থ শ্রেণী।)

জাপান শীত-প্রধান দেশ। ভারতবর্ষের ন্যায় জাপান দেশ নহে, বিলাতের ন্যায় ইহা দ্বীপ, একটী দ্বীপ নহে—দ্বীপপুঞ্জ। ছোট বড় অনেকগুলি দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। ফলতঃ জাপান অতি সুন্দর দেশ, জাপানের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। জাপানের স্বভাবের শোভা অতি মনোহর। এখানকার গাছেরা যেন কথা বলে, নদীগুলি যেন কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া সুস্বরে গীত করে, চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ের গায়ে যেন কি দৈববাণী লেখা আছে; সকলই যেন অপূর্ব্ব সুন্দর। কোথায়ও বুদ্ধের মঠ কোথায়ও বা মহাসমুদ্র দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপর বাড়ী, কোথায়ও অস্ফুট অন্ধকারময় নিরাশার মত কম্পমান বনারণ্য। বসন্তকালে যখন চেরিগাছ সকল মুকুলিত হয় ও সেই ফুলের রেণু তাহার সৌরভ যখন চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় তখন মনে হয় বুঝি সপারিজাত ইন্দ্রের অমরাবতী উৎপাটিত হইয়া জাপানে স্থাপিত হইয়াছে। জাপানের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটী। জাপানের অতি নিকটে কোরিয়া ও চীনদেশ। বঙ্গদেশে আর্য্যগণ যেরূপ, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ জাপানিরাও "আইনো" নামক অসভ্য জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া উত্তর

দিকে শীতপ্রধান দেশসমূহে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। জাপানীদের আকার প্রকার আচার ব্যবহার অনেকটা বাঙ্গালীদের মত। বাঙ্গালীদের ন্যায় জাপানীরা মেঝের উপর বসিয়া আহার করে। মাছ ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য। জাপানের চারিদিকে সমুদ্র, সেই সমুদ্রে অনেক লোকে মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জাপানী মহিলারা পুতুলের মত সুন্দর। জাপানী মহিলারা তাহাদের শিশুদের শাস্তি দেয় না, সর্ব্বদা আদর করিয়া কোলেপিঠে লইয়া বেড়ায়। জাপানীরা ভাত খাইয়া দিনপাত করে। সে নিমিত্ত এ দেশে ধানের চাষ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। জাপানের মত পরিশ্রমী চাষী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। জাপানী কৃষকগণ বিষ্ঠাকে বিষ্ঠা জ্ঞান করে না বটে কিন্তু তাহা হইলেও অন্যান্য বিষয়ে জাপানীরা অতি পরিস্কার। জাপানীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করে; দেখিলে মনে হয় যেন সে গুলি পুতুলের ঘর। কিন্তু ঘরগুলি অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। জাপানের অনেক স্থান পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ফুজিসান পর্ব্বতটাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইহার শিখরদেশ আট হাজার হাত উচ্চ। ফুজিসান পর্ব্বতের মস্তকটা দেখিতে ঠিক অষ্টদল পদ্মের ন্যায়। জাপান-বাসীদের ইহা একটী তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে অনেক যাত্রী ইহার উপর আরোহণ করে। জাপানীরা জার্ম্মানদের নিকট অস্ত্র চিকিৎসা শিখিয়াছে, ইংরেজের নিকট বিজ্ঞান ও প্রচার কার্য্য শিখিয়াছে, চীনদের নিকট রেশমের ব্যবসায় শিখিয়াছে, কিন্তু এখন জাপানীরা সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা অতিক্রম করিয়াছে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ইহারা ঘুড়ি উড়াইতে ভালবাসে। জাপানীরা সকল সময়ে প্রফুল্লচিত্তে সমস্ত কার্য্য করে। এমন দেশে যে সর্ব্বদাই প্রফুল্লচিত্তে বাস করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

A night in a deep forest.

Bejoy Chandra Ghosh.

In the evening of the 2nd December, 1909, I reached at Nowgong about twelve miles off from the Jeraikela Railway

Station, in Chotonagpur. I stopped there for the night in a forest-bunglow, located in the heart of a deep hilly forest. The golden rays of the setting sun departed with all their glory. The new moon night spread her dark apron over the dense forest. The hills all round, teeming with wild fertility, looked like horrible dark pillars of the spacious starry firmament. As the night was advancing with all her (shudderings and) gloominess, my energies began to sink within me. Prior to this adventure I had here had the occasion of passing such a dreadful night at such a horrible place. The profound silence of the place inspired my awe. My heart turned within me even of the sound of a falling leaf. My only companions, in that lonely amphitheatre, were two koles who carried my bags and baggages. Owing to day's hard labour, they fell into a deep sleep in the early part of the evening, out side my room. To my sheer misfortune, inspite of my hard labour during the day, sleep forsook my eyes. I stretched my weary limbs on a bed (and bagan to enjoy the solemn silence of the night.) The murmuring sound of a running brook, leaping from hill to hill, disturbed the most mysterious silence of the dreadful night. Hours rolled on but sleep did not soothe my aching heart. At about 1 A. M. I heard a few terrible roars of some wild beasts coming from a distant hill which echoed along the lofty rocks like peals of thunder. My language fails to describe the panic which chilled my heart at that time. I was so much frightened that I thought of calling up my companions (the two koles) but as their language was quite unintelligible to me, I gave up the idea of disturbing them and entirely submitted to the will of God. Though by an irony of fate, I was dragged to such a place, deserted by friends and foes alike, I was not deprived of the mercy of God. Some light thoughts, one after

another, crossed my mind and I felt the embrace of sleep, stealthily closing my weary eyelids. My consciousness about this material world gradually vanished and I was carried to an imaginary world of eternal bliss and happiness. On waking, I found, that the sun was peeping through the window, smiling at my failure in rising earlier. In a hurry, I finished my ablutions and resumed my journey with fresh energy. Who knows when and where will my journey of life end ?

Editorial Notes.

On the 26th August last our school was visited by Babu Narendranath Ganguly M. A., as the second Inspector of schools Presidency Division, to see if the school can be permanently recognised. He with the help of the District Inspector and his assistants, thoroughly inspected the records of the school and was pleased with the financial position. strict discipline and good regular working of the institution.

We express our deep sense of sorrow at the death of Babu Aghorenath Roy Chowdhury B. A. of Baniakhamar and mourn his loss with his relatives and friends. He was an edutionist and one of the principal donors of this Institution. We convey our heartfelt sympathy to his son Babu Amulya Kumar Roy chowdhury B. L., a member of our school. Thirty years before, it was the late lamented Babu Aghorenath Ray Chowdhury who started a High school in the town for the education of the poor stndents of the town and the suburb. He himself, our late secretary Mr. Mukherjee and the writer were the senior teachers of the school. He had all along tried his level best to make

the school successful and to have it recognised by the University Subsequently when another school was started by some leading self-sacrificing gentlemen of the town, both the schools were united into the present B. K. Union Institution which bears the name of his late revered father Barada Kanta. He was not only a pioneer of establishing an educational institution in this town but he also started the first weekly 'The Khulna' in the District.

Primary Education.

It is satisfactory to note that the Government has at last placed the Free Primary Education Bill before the Bengal Legislative Council, which has handed it over to a select committee. Ever since the time of late Mr. Gokhale of revered memory, the Government was silent on free compulsory mass education which alone can raise up a nation. Now the Government has fully understood the usefulness of the policy and has taken upon itself the work. But although we are, glad that compulsory steps will be taken to teach the three Rs to the children from 6 to 11 years of age at a cost of a crore of rupees, we are afraid that in a province already over taxed, the new education cess-pice five (or four as decided by the select committee) on one rupee—will tell much upon the economic condition of the poor rate-payers from whom the Government proposes to collect the amount. The Government should subscribe a substantial portion of the whole expenditure on Primary education as is now done on the system of education introduced by Mr. Biss. The Governments of Bombay and Madras also pay a substantial portion of the expenditure on mass education.

Athletic Club.

We are glad to note that the students have won the Sivadas Memorial Shield this year. The little boys also, though defeated in the final game, have shown their zeal and skill in connection with the S. M. Cup tournament, Some students have been the associates of Lathi and dagger plays and they have displayed their skill and enthusiasm in them.